গার্জেনভিলার রহস্য ও অন্যান্য গল্প

জ্যোতির্ময় ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ছোটো আর বড়ো

নানা ধরনের হাজারটা দুঃখ-কষ্ট-সমস্যা জীবনে আছে। শৈশব-কৈশোর থেকেই থাকে। অনেকেরই। সমাজব্যবস্থার আমূল বদল না ঘটলে মন্ত্রবলে বাধাবিপত্তিগুলি দূর হবে না। তবু সব সমাজেই ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন, সংকল্প, শ্রম, সততা ও লড়াই করার মানসিকতা গড়ে-তোলা দরকার। এসব কথা মনে রেখেই আখ্যানগুলির বয়ন। টিকলু-জয়রা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে গেল। ওদের জন্যে অন্যরকম লেখাই ভালো। কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাই এই বই দিলাম যাদের, তারা নিজেরা আর একটু বড়ো হলে পড়বে। এখন পড়বে তাদের দাদা-দিদিরা। বড়োরাও নিশ্চয়ই। ছোটোদের আমরা যত ছোটো ভাবি, তারা তা' নয়। আবার বড়োদের মধ্যেও ছোটোরাও থেকেই যায়।

আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান সাত্তারের আগ্রহ ও শ্রুতিকীর্তি প্রকাশক শ্রীমান সন্দীপের সময়োচিত তৎপরতা ছাড়া বইটির আত্মপ্রকাশ ত্বরিত ও মনোজ্ঞ হতে পারত না। সুতপা, অনিন্দিতা, রেশমা ও টুকটুকি : এই চতুষ্পর্ণ ছাড়াও গ্রন্থনা সময়সাধ্য হতো। সকলের জন্যই রইল অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

ইতি

জানুয়ারি ৯, ২০০৪

সূচিপত্র

ফুলের নাম জভেরা	১১
কল্পনা সে নয়!	১৩
ডুমুরের ঝোল	১৭
একটি হীরক জয়ন্তী	২০
দূরত্ব	২৩
স্বপ্নের চার	২৬
ফুল পড়ে নি	৩০
তুম্বুনি পাহাড় ছাড়িয়ে	৩৩
ঝিমড়ির সমস্যা	৩৬
অহল্যা-সিরাজের গল্প	৪০
ন' লাখিয়ার বৃত্তান্ত	৪৫
বাদশাহি চুনি	৫৮
ঝুমকি কোথায় গেল	৬৫
আদিনা মসজিদে সেদিন	৭৪
বৈদূর্যমণির সন্ধানে	৮১
গার্জেনভিলার রহস্য	৮৭

ফুলের নাম জভেরা

মেঘলা দুপুরে কখন যে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে চারিপাশ একেবারেই খেয়াল করতে পারেনি নিষ্ঠা। তিনতলায় জানালায় মাথা রেখে বাইরে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। চারিপাশের গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা এই মেয়েদের হস্টেলটায় আরও কয়েকজন বাঙালি মেয়ে আছে। তবু মহারাষ্ট্রের এই পাহাড়-পাহাড় শহরে বসে ওদের কলকাতার সল্টলেকের পাড়াটার শ্যামলিমা ও গত মাস-দুয়েকের শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনুভব করতে পারেনি। আজ বিনা চেষ্টাতেই সেই শ্যাম-স্নিগ্ধতা নাকে-মুখে-চোখে স্পর্শ দিয়ে গেল নিষ্ঠাকে। ভিতর থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল খুবই চেনা গলায় একটি কলি—

আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে। তাই যতই মনে-মনে ডেকে সারা হয়ে যাই, তোমার সাড়া তো পাইনা কিছুতে।

আসলে উত্তরণ বাঁশি বাজাত চমৎকার। দুঃখেরই সুর বাজত তার বাঁশিতে। যেমন আছে এই গানটির পরের অংশে। নিষ্ঠা মন-প্রাণ দিয়ে সেই বাঁশির সুরের অনুষঙ্গে অনায়াসে বলতে পারত— তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে/কঠিন দুখে, গভীর সুখে। রাতের আকাশের দিকে তাকানোর সময় এখনও হয়নি রণ, কিন্তু একটা জিনিস এখনই বলে দিতে পারি তোমায়, আমি যে এই মুহূর্তে তোমাকেই চাইছি, সেকথা বলতে পারি না জোরের সঙ্গে। মাকে চাই, না কি বাবাকে কিংবা দাদাইকে না কি কাজের দিদি মিতালিদিকে কিংবা ওর কোলের বাচ্চা দু'টিকে, কিছুই ঠিক বলতে পারি না। আকাশ চাই না বাতাস চাই, গান চাই না ফুল চাই, প্রাণ চাই না প্রাণের কোনো মানুষকে, কিছুই বলতে পারি না জোর করে। সপ্তমী, অনন্যা, অভ্র না বীতশোককে, কিছুই বলতে পারব না ঠিক করে! না কি ওদের সব্বাইকে একসঙ্গে চাই। আমাদের কলকাতার বাসার ঘরে, তা-ও কি জানি ঠিক-ঠাক!

তাহলে কোন্ 'তুমি'কে মনে পড়ল হঠাৎ আমার? জানি না, কাকে এখন চাই আমার। আমার চাওয়া আর আমার মনের চাওয়া— এই দুই চাওয়ার মধ্যেও কি মিল আছে কোথাও কোনো? ওই গানটার মধ্যেই আর একটা কলি আছে না?— মন যে কী

চায় তা মনই জানে— আমার অবস্থাটা সেইরকমই। আমি জানি না তবু অকারণেই কীসের আশা ক্ষণে ক্ষণে জাগে আমার মনে! ব্যথার টানেই সেই বাঞ্ছিত তুমি কি এসে পৌঁছে যাবে আমার দরোজার কাছে?

এই অন্ধকারে আলো জ্বলেনি আমার ঘরে। সত্যিই আলো জ্বালা হয়নি। সামান্য একটু ইচ্ছে নিয়ে যে সুইচটা টিপে জ্বালিয়ে দেব আলো, সেটুকু চেষ্টাও আসছে না ভেতর থেকে। আশেপাশে কেউ এখন নেই। বৃষ্টি এলে ভিজবে সেই ধারায়, এই আশা নিয়ে মেধা আর সুছন্দা আমার ঘরের এই বাকি দু'জন বাসিন্দা উঠে পড়েছে পাঁচতলার ছাদে। কাকে যে বলব আমার বিজনঘরের কোণে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যেতে, জানি না।

আমাদের আর একজন কবি লিখেছিলেন না— বিকেলে অসম্ভব বিষন্নতা? সেই বিষন্নতাই কি আমার বুক-গলা-ঠোঁট সমস্তই চেপে ধরেছে? ধরেই থাকবে অনন্তকাল?

এমন সময়ে, শ্রাবণের আকাশটাকে বিদীর্ণ করে গেল বিদ্যুতের রেখা। পড়ার টেবিলের পরে চোখে পড়ল পোস্টকার্ড সাইজের তাঁর একটি ছবি। কিন্তু সেই ছবিতে কোনো মালা নেই কেন? বেলফুলের মালা কিংবা রজনীগন্ধার কয়েকটা স্টিক?

দুঃখে যখন মনটা টন্‌টন্‌ করছে, বুকের ভেতরটা থেকে উঠে অসহায় একটা আর্তি মস্তিষ্কের কোষে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ, তখনই দড়াম করে দরোজাটা খুলে গেল ঝোড়ো হাওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মেধাও দৌড়ে এল ঘরের মধ্যে— 'নিষ্ঠা, এই দেখো··· তুমি আমার জন্মদিনে গিফ্‌ট দিয়েছিল না পরশুদিন? তুমি এত ফুল ভালোবাসো! আমরা বেরিয়েছিলাম লক্ষ্মী মার্কেটে। এ ভাই তোমাদের কলকাতার বেলফুল নয়, রজনীগন্ধাও নয়, তবু আমি যা পেয়েছি নিয়ে এসেছি··· এই কতগুলো ফুল··· এখানে, পুনায় সবাই বলে জভেরা··· জভেরা তো নয় যেন জাদু ফুল···

মেধার কথাগুলো নিষ্ঠার বুকে গিয়ে বিঁধল। জভেরা ফুলগুলো সে মেধার হাত থেকে নিল। অঞ্জলি পূর্ণ করে উজাড় করে দিল ছবিটার নিচে— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখল মেধা আর ততক্ষণে হাজির সুছন্দাও! আশ্চর্য দৃশ্যরূপ তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তে!

ঃ কার ছবি রে?

ঃ আজ বাইশে শ্রাবণ। কার ছবি হতে পারে, তোরাই বল্‌ না···

কল্পনা সে নয়!

শুক্কুরবারে আমি কিন্তু আসতে পারব না···

নখ দিয়ে মেঝেটা খুঁড়তে খুঁড়তে মাথাটা একটু নিচু করে লক্ষ্মী খুব আস্তে গলায় কথাগুলো বলল। বলল না বলে কোনোক্রমে বলে ফেলল বলাই ভালো। অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ অনেক অস্বস্তি কাটিয়ে কথাগুলো তাকে বলতেই হল। বাড়ির গৃহিণী ডাকসাইটে দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রিন্সিপাল বাসনা চক্রবর্তী ভুরু দুটো কোঁচকালেন একবার। এখন অবশ্য আর প্রিন্সিপাল নন তিনি। অবসর নিয়েছেন প্রায় বছর তিনেক হল। তার আগে বারো বছর একটা বড়ো মেয়ে কলেজে লেকচারার ছিলেন। কোনোদিন ক্লাস কামাই করেননি। ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই ক্লাসে ঢুকেছেন। ঘণ্টা পড়ার আগেই কোনোদিন ক্লাস ছাড়েননি। পাঠ্য বই-এর বাইরে কোনোদিন একটিও অবান্তর কথা বলেননি। শৃঙ্খলাবোধ তাঁর মনের মধ্যে শিকড় চারিয়েছিল। সময়মতো সব কাজই করেছেন আবার অকারণে কেউ কখনো তাঁকে নিষ্ঠুর হতে দেখেনি। পরে দু'দশকের বেশি সময় প্রিন্সিপালের পদে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন।

তাঁরই কাজের মেয়ে লক্ষ্মী। বাসনা একমাত্র সন্তান তনিমার বিয়ের পরে অবসরপ্রাপ্ত স্বামী মণিমোহনকে নিয়ে অবসর জীবনযাপন করছেন। সকালের খবরের কাগজ পড়া থেকে সারা দিনরাত জড়িয়ে মনের মতো কিছুটা লেখাপড়ার কাজ ছাড়াও মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় সময় তাঁর ভালোই কাটছে। কিন্তু সাত-আটমাস যাবৎ পায়ের ব্যথাটা বড়ো বেশি ভোগাচ্ছে বলে ঘরে কিংবা বাইরে চলাফেরা অনেকটাই ব্যাহত হয়ে গেছে। প্রথম মাসদুয়েকের কষ্টের পর লক্ষ্মী এল তাঁর কাছে।

বাসনা আর মণিমোহন দুজনের কেউ বিলাসিতা পছন্দ করেন না। দুজনেই পড়তে ভালোবাসেন। দুজনেরই অল্পস্বল্প লেখার ঝোঁক আছে। লক্ষ্মীর তৎপরতায় সংসারে কাজের বোঝা অনেকটাই লঘু হয়ে যাওয়ায় দুজনেই পড়া আর লেখার বেশ কিছুটা অবকাশ পেলেন।

লক্ষ্মীও পছন্দ করে ফেলল দুটি মানুষের সংসারে এই পরিবেশটা। লক্ষ্মীর বাপের

বাড়ি সুন্দরবনের দিকে ছিল কোনো এক গ্রামে। মা-বাপ মরা মেয়েটি গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশোনা করতেই খেতমজুর মামা সুজনের সঙ্গে ল'ক্ষ্মীর বিয়েটা সেরে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করল।

লক্ষ্মীর মনটা কিন্তু ভেঙে গেল। সে মাধ্যমিক পাস করে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে কাছাকাছি কোনো কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখছিল তখন কিন্তু অভাবের সংসারে মামার দুশ্চিন্তা দেখে চোখের জল গোপন করে সে বিয়েটাকে মেনেই নিল।

সুজন ওর থেকে বয়সে দশ-বারো বছরের বড়ো। সে-ও স্কুলের গণ্ডি পেরোতে না পেরে গ্রাম থেকে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটুকুর মধ্যে একটা রিকশা চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। অসুস্থ মা-বাবা আর গুটিকয়েক ভাইবোনকে নিয়ে তার সংসার খুব কষ্টেই চলছিল। তবু ডাগরডোগর চাঁদপানা মুখের মেয়েটাকে তার খুব মনে ধরে গিয়েছিল বলে সে বিয়ের ঝুঁকিটা নিয়েই ফেলল।

বছর দুই গ্রামে কাটিয়ে মা-বাপকে খুইয়ে তিন-তিনটি ভাই-বোন আর লক্ষ্মীর হাত ধরে সে একদিন শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল। সুজনের দেশ ছিল খুলনা জেলায়। লতায় পাতায় কী একটা সম্পর্ক বের হতেই মুরারিপুকুরের এই বস্তিটায় একটা ঘর সে জুটিয়ে ফেলল। এখন চালায় ঠেলাগাড়ি। দুটো পয়সার মুখ দেখতে পায়। একটি ছেলেও হয়েছে তার। সে এখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

স্বামীর রোজগারের সঙ্গে লক্ষ্মী দু'তিনটি পরিবারে কোথাও রান্নার কাজ, কোথাও বাসন মাজার কাজ, কোথাও বা এই দু'ধরনের কাজের বিনিময়ে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা যোগ করে জীবনটা চালিয়ে যাচ্ছে। তার মনে দুটো স্বপ্ন। ছেলেটাকে সে শেষপর্যন্ত পড়াবে। আর ছেলে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তখন সে-ও ছেলের সঙ্গে পরীক্ষায় বসে পড়বে। খুঁটিনাটি নিয়মকানুন না জানলেও এটুকু সে শুনেছে মনের জোর থাকলে ভবিষ্যতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে পড়াটা অসম্ভব হবে না।

বড়ো দেওরটির বয়স এখন প্রায় চব্বিশ। সে বারাসতের দিকে ভ্যানরিকশা চালায়। তার ছোটো ভাইটি একটা মুদির দোকানে কাজ করতে করতে প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করতে না পারলেও দ্বিতীয়বার বউদির জবরদস্তিতে পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরি হয়। বছর দুই আগে ননদের বিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মী— একজন প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে। লক্ষ্মীর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য তার ননদকে নিয়ে। ননদ বি. এ. পাস করার পরে তবে সে তার বিয়ে দিয়েছে। কাজের বাড়িগুলি থেকে বেশকিছু ধার কর্জ করে ননদের বিয়েটা সে ভালোভাবেই দিয়েছে।

নিজের আর স্বামীর রোজগারের পয়সা থেকে লক্ষ্মী বারাসতের কাছে এক টুকরো জমি কেনার স্বপ্নও দেখছে। সুজন মাঝে মাঝে নড়বড়ে হয়ে যায়। লক্ষ্মী তখন তাকে মৃদুমন্দ মুখঝামটা দিয়ে চাঙ্গা করে। বলে—

ঃ তোমারেও মাধ্যমিক দিতি হবে কিন্তু···

শুক্রবার লক্ষ্মী আসতে পারবে না শুনে ভুরু কোঁচকালেন বাসনা। লক্ষ্মীকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করলেও আর লক্ষ্মীর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টার প্রতি তাঁর উৎসাহ থাকলেও তাঁর মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। খেতে বসে সেই সন্দেহটা তিনি স্বামীর কাছে প্রকাশ করে ফেললেন—

ঃ হ্যাঁগো, লক্ষ্মীর মাথায় ভূত চাপল নাতো···

ঃ কেন? ভূত চাপবে কেন? কীসের ভূত?

ঃ আমার কলকাতার কলেজে অতি আধুনিক মেয়েদের অনেকেই মঙ্গল আর শুক্রবার রীতিমতো নেতিয়ে পড়তো যে। সে কথা কি আমি গত তিন বছরে সবই ভুলে গেছি নাকি?

ঃ তুমি কি ওই সন্তোষি টন্তোসি জাতীয় কিছু ভাবছ নাকি?

ঃ তোমার কি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে?

ঃ ন্ ন হা··· সংসারে অসম্ভব আর কী! তবে এর আগে তো এই ধরনের ছুটি-ছাটা নিতে ওকে দেখিনি কখনো···

ঃ আগে করেনি, এখন থেকে হয়তো শুরু হল!

ঃ ও যদি এইসব ব্রত-ফ্রত পালন শুরুই করে, ঠেকাতে পারবে তুমি?

ঃ নাহ্। কে আর কাকে ঠেকাতে পারে বলো! এ নিয়ে তুমি আর ভেব না।

ঃ তবে কী জানো, সামনের বৃহস্পতি বা শুক্রবার বোধহয় এবারে মহালয়াও পড়েছে। সে-সবও তো আবার অনেকেই করে। ওরা তেমন কিছু করতে পারে···

ঃ মহালয়ার বিরুদ্ধে বললে কত লোক তোমাকে ধিক্কার দেবে, তা জানো তুমি?

মণিমোহন আর বাসনার সংলাপ মাঝেমাঝেই লক্ষ্মীর শুক্রবারের ছুটি চাওয়াকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। আসলে, দুটি দশকের বেশি প্রিন্সিপালগিরি করে বাসনা শৃঙ্খলার বাইরে কাউকে যেতে দেখলেই মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাজের সময়ে বাসনা লক্ষ্মীকে বেশ চোখে চোখেই রাখেন। ছুটি তো তিনি দিয়েছেন শুক্রবারের জন্য কিন্তু শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত চুপচাপ কাটিয়ে সামান্য একটু পোশাক পরিবর্তন করে বাসনা মণিমোহনকে বললেন—

ঃ চলো, একটু ঘুরে আসি। পায়ে ব্যথা হলেও মাঝেমধ্যে একটু হাঁটাহাটি করা ভালো।

মণিমোহনের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিলেও বাসনার কথায় আপত্তি না করে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বাসনাকে অনুসরণ করলেন। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েই সামনে দেখতে পেলেন নটবরকে। নটবর মাঝেমধ্যে বাসনার ফাইফরমাশ খাটতে আসে, বাসনা তাকে দু'দশটা টাকাও দিয়ে থাকেন। মণিমোহন বুঝতে পারলেন, নটবরকে আজ এই সময়ে আসার জন্য বলে রেখেছিলেন নিশ্চয়ই বাসনা। পথে বেরোতেই সেটা স্পষ্ট হল। শেষপর্যন্ত নটবরই পথ দেখিয়ে বাসনা আর মণিমোহনকে নিয়ে যায় লক্ষ্মীদের বস্তি পর্যন্ত। বস্তির লোকদের জিজ্ঞেস করে লক্ষ্মী-সুজনের ঘরের দরোজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন দুজনেই।